ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 2, No. 2, December 2025

কবিগান ও রবীন্দ্রনাথ

ড. সুবীর ঘোষ[1*]
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
Corresponding Author: Subir Ghosh, subirghosh@bhu.ac.in

ARTICLEINFO

সূচকশব্দ: অন্ত্যেবাসী, অপাংক্তেয়, কবিওয়ালা, কবিগান, জনসাহিত্য, বাহবা, জনমনোরঞ্জন

Received : 03 August 2025
Revised : 30 November 2025
Accepted: 23 December 2025

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রার সূত্রপাত সংগীত দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে সর্বজন স্বীকৃত চর্যা-গীতিকা আগে গান, পরে সাহিত্য। এই আদি বাংলা সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সাহিত্যধারার সিংহভাগ জুড়েই রয়ে গেছে সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষজনের জীবন সংগ্রাম ও জীবনচর্যার বহু বিচিত্র আখ্যান। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজনই যে সাহিত্যের সর্বাধিক জায়গা অধিকার করে আছে, তাই নয়- অনেকক্ষেত্রে সাহিত্যকে চালনাও করেছে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন। কেননা অভিজাত সাহিত্যের পাশাপাশি লোকসাহিত্যেও যে ধারা সমান্তরাল ভাবে ক্রিয়াশীল, তাকে সম্পূর্ণভাবেই লালন করে চলেছে তথাকথিত পল্লিবাংলার অখ্যাত অপাংক্তেয় মানুষজন। কিন্তু লোকশিল্পীর তকমাটুকু ছাড়া সাহিত্যের আঙিনায় তাঁদের তেমন কোনো কদর নেই। সেই লোকশিল্পীদেরই অন্যতম হলেন কবিওয়ালারা। কবিওয়ালা যে গান গায়, তাকে কবিগান বলা হয়। কবিগান অখণ্ড বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সংগীতধারা। ভারতচন্দ্র পরবর্তীকালে সাহিত্যক্ষেত্রে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেই শূন্যতা পূরণে কাব্য ও সংগীতধারা রাজসভা থেকে নেমে এসে নানা রূপ পরিগ্রহ করে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। 'জনসাহিত্য' নামে একটি নতুন শাখার সৃষ্টিও এই সময় থেকেই শুরু হতে দেখা যায়। কেননা সাহিত্য তখন জনসাধারণের দরবারে উপস্থিত। তাই কবিওয়ালারাও রাজা বা পাণ্ডিতসমাজের প্রশংসাপত্রের প্রত্যাশী না হয়ে, বরং গণদেবতার আশীর্বাদ ও 'বাহবা'র প্রত্যাশী হলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ধরে জনমনোরঞ্জনের গুরুদায়িত্ব পালন করে কবিগান তাই আজও সমানভাবে বহমান। তবে সেই ধারা বর্তমানে যথেষ্টই ক্ষীণ ও অচিশ্চিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলা সাহিত্যে কবিগান চিরকালই বহু বিতর্কিত সাহিত্যবস্তু। সেইসঙ্গে উপেক্ষা ও অনাদরেরও। অন্যান্য বেশ কিছু লোকায়ত সংগীতের মতোই শিক্ষিত সুশীল বাঙালি চিরকালই কবিগানের থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। কবিগান কেবল লোকজ মানুষের উপাদেয় হয়েই রয়ে গেছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে স্বদেশীয়ানার টানে কবিগানের প্রতি রুচিশীল বাঙালির সদয় দৃষ্টি কিছুটা পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায় কেউই কবিগান বিষয়ে খুব বেশি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেননি। তাঁদের যুক্তি অনুযায়ী কবিগান হয়তো সেই প্রশংসা দাবিও করতে পারে না। কিন্তু কবিগানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষিতের বিচারে কবিগানকে গুরুত্বহীন করে রাখা, নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের প্রতি অবজ্ঞার করার সামিল, একথা বাঙালি যত তাড়াতাড়ি বুঝবে, ততই মঙ্গল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বাংলা সাহিত্য' (১২৮৭ বঙ্গাব্দে ৩০ চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত) প্রবন্ধে, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সারস্বত কুঞ্জ' (১৮৮৮ খ্রিঃ) নামে প্রবন্ধগ্রন্থে কবিগান বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, সেখানে প্রশংসা বাক্য তো নেই-ই বরং নিন্দার ভাগই বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' (বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০) প্রবন্ধে এবং 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ'- এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে কবিগান সম্পর্কে যে সামান্য কালি খরচ করেছেন, তাতেও একই সুরের বহিঃপ্রকাশ। তবে বঙ্কিমের সমালোচনার ঝাঁজ কিছুটা হলেও মৃদু।

অনেকেই কবিগানকে বাংলা সাহিত্যে অনাহূত ও অনধিকার প্রবেশকারী ধরে নিয়ে কলমের খোঁচায় রক্তাক্ত করেছেন। কিন্তু কবিগান বিষয়ে সবচেয়ে নির্দয় সমালোচনা শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের গলায়। রবীন্দ্রনাথের কলমে কবিগানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে শ্লেষ, বিদ্রূপ, ভৎসনা, কটূক্তি ও নির্ভেজাল সমালোচনা উঠে এসেছে তা বাংলা সাহিত্যে কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্যের কপালে জুটেছে কিনা সন্দেহ আছে। কবিগানের বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, সুর, ছন্দ, যন্ত্রসঙ্গত, গায়ক, উদ্যোক্তা, শ্রোতা, রচনাপদ্ধতি, সংগীত পরিবেশন, কবিগানের জন্মলগ্ন অর্থাৎ আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি সবই মন্দ ও নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। কবিগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ ভরা সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে যে রচনায় তার নাম 'কবি-সংগীত' (সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১) যা তাঁর 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৩০১ বঙ্গাব্দে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) সম্পাদিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' বা 'প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ' (১৮৯৪) গ্রন্থের একটি সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' (১৩০১) পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিই পরবর্তীকালে তাঁরই 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থে 'কবি-সংগীত' (সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১) নামে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে কবিগান বিষয়ে যে তীক্ষ্ণ আক্রমণাত্মক সমালোচনা করা হয়, তা সাম্প্রতিক সময়ের অনেক গবেষকেরই একপেশে বলে মনে হয়েছে। আমি নিজেও সেই সমস্ত নব্য সমালোচকদের অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে মননশীলতার ও রসগ্রাহিতার অভাব নেই। কিন্তু তারপরও কবিগান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপমিশ্রিত কথাগুলি যুক্তির বিচাওে মেনে নেওয়া যায় না। যে সমস্ত জায়গায় রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিদ্রূপাত্মক শ্লেষ একপাক্ষিক মনে হয়েছে, যুক্তিসহ সেগুলি তুলে ধরলেই আধুনিক পাঠক-সমালোচকের কাছে তা অনেক বেশি উন্মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি মনে করি। কবিগানের আবির্ভাবকাল এবং অবলুপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক মত হল-

> 'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালার গান এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়- এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনো তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই।'[১]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, এই 'নষ্টপরমায়ু' কবিগানের আয়ু অত্যন্ত কম এবং এগুলি হঠাৎ আবির্ভূত। কিন্তু কবিগান বিষয়ে এযাবৎ কালে যত আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, সর্বত্রই কবিগানের জন্মসূত্র নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও অবলুপ্তি নিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় একমত। কেননা কবিগান যে অবলুপ্ত নয় তা জানার জন্য বড় কোনো গবেষক-সমালোচক হওয়ার দরকার নেই। বাঙালি মাত্রেই জানে কবিগানের অস্তিত্ব অভিন্ন বাংলাদেশে কিছুটা ক্ষীণ ও বিপন্ন ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি অবলুপ্ত এটা একেবারেই ঠিক নয়। আজকের সময়েও যে কবিগানের আসর বসে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজের জীবদ্দশায় একাধিকবার শান্তিনিকেতনে কবিগান শুনেছেন এবং কবিগানের আসর বসিয়েছেন।

আর অন্যদিকে, কবিগানের জন্মসূত্র নিয়ে যতই মতপার্থক্য থাক না কেন, একটি বিষয় স্পষ্ট যে কবিগান একদিনে সৃষ্টি হয়নি এবং হঠাৎ করেও সৃষ্টি হয়নি। অষ্টাদশ শতকের প্রাথমিক পর্বের কবিগানে নদে-শান্তিপুরের 'খেঁড়ু' গান বা খেউড় গানের যেমন প্রভাব আছে, পাশাপাশি রাঢ় বীরভূমের কবিগানে আছে প্রাচীন ঝুমুরের প্রভাব। কবিগান আসলে মিশ্ররীতির সংগীতকর্ম। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন নামে প্রচলিত পয়ার, পাঁচালি, ঝুমুর, টপ্পা, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ঢপকীর্তন, পালাগান প্রভৃতি বিচিত্রনামা সংগীতকর্মের সংমিশ্রণে কবিগান সৃষ্টি হয়েছে। কবিগান বাংলার লোকজ সম্পদ, সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষজনের পরম উপাদেয় সামগ্রী। তাই কবিগানের জন্মদিন-মৃত্যুদিন নিরূপণ করাও সহজ

কাজ নয়। রবীন্দ্রনাথ কবিগানের যে 'স্বল্প পরমায়ু' নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা যে সত্যি নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধ লিখছেন, তখনই কবিগান কম করে হলেও ১৫০ বছরের বেশি সময় কাটিয়ে চলে এসেছে। কেননা ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেছেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশেরই মত কবিগানের স্বর্ণযুগ হল ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল। আর এখনও কবিগানের 'কোন সাড়াশব্দ' যদি রবীন্দ্রনাথ শুনতে না পান, সেটিও কবিওয়ালা ও কবিগানের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে। এখানে কবিগানের দোষ দেওয়া সমীচীন নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শহর কলকাতা থেকে কবিগানের অবলুপ্তি ঘটেছে, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু কবিগানের নিজস্ব জন্মভিটে গ্রামবাংলা থেকে কবিগান অবলুপ্ত হয়ে যায়নি- রবীন্দ্রনাথের সময়েও যায়নি, এমনকি সাম্প্রতিক সময়েও বহাল তবীয়তে বর্তমান আছে একালের কবিগান। কেবল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেই না, পূর্ববঙ্গেও সমানতালে জনপ্রিয়তার সাক্ষর রেখে চলেছে বর্তমান সময়েও কবিগান যে 'নষ্টপরমায়ু' নয়, রবীন্দ্রনাথও তার প্রমাণ পেয়েছিলেন জীবনের প্রায় উপান্তে এসে। শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ যখন গুমানী দেওয়ানের কবিগান শুনলেন, তখন যে তাঁর পূর্ব-ধারনার পরিবর্তন হয়েছিল তা কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় একাধিকবার কবিগানের আসর বসাতেন না শান্তিনিকেতনে। গুমানী দেওয়ান (১৮৮৬-১৯৭৬, জিনদীঘি, মুর্শিদাবাদ), লম্বোদর চক্রবর্তী (খুরুন, বীরভূম), আব্দুল জোব্বার (কোটালডিহি, মুর্শিদাবাদ), বসন্ত সরকার (হাঁসপুর, ধলিয়ান, মুর্শিদাবাদ) প্রমুখ কবিয়াল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়েছেন একাধিকবার। বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল গুমানী দেওয়ানের জীবনীকার আবদুর রাকিব সাহেব (১৯৩৯-২০১৮) তাঁর 'চারণকবি গুমানী দেওয়ান' (১৯৬৮) বইতে কবিগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিবর্তনের আভাস দিয়ে গেছেন।[২] তবে রবীন্দ্রনাথ কবিগান বিষয়ে তাঁর পরিবর্তিত ধারণার কোনো লিখিত প্রমাণ রেখে যাননি বা অন্য কোনো প্রবন্ধ রচনা করে যাননি, এটাই যা আক্ষেপের। সেইসঙ্গে এটাও দুঃখের যে, কোনো রবীন্দ্রজীবনীকারও এই বিষয়ে কালি খরচ করেননি। পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢ়ের কবিগান যে মরে যায়নি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, এখনও রাঢ়ের কবিগান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে। এমনকি ড. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) ও সুধী প্রধানের (১৯৯১-১৯৯৭) মতো সংগ্রাহক ও সমালোচকেরা রাঢ়ের কবিগান নিয়ে এবং বাংলাদেশের অসংখ্য সংগ্রাহক ও সমালোচক পূর্ববঙ্গের কবিগান নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করে গেছেন এবং কবিগানের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে গেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট অভিযোগ সত্যি বলি কি করে! রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন-

> 'পূর্ববর্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল ও ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে জোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল ও বিকীর্ণ। তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প-আকারে প্রফুল্ল এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন-আকারে সম্মিশ্রিত।'[৩]

আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার কবিওয়ালারা নিছক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে কবিগান রচনা করেননি বা গান পরিবেশন করেননি। সে চেষ্টা তাদের করাও সাজে না। 'হঠাৎ রাজার দরবারে' অশিক্ষিত দর্শক-শ্রোতার মনে 'ক্ষণিক উত্তেজনা' সৃষ্টিই কবিগানের একমাত্র লক্ষ্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। তাই "এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার এবং সর্ববিষয়ে রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়" বলে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ পুরোপুরি সংগত। কিন্তু কবিগানকে তার সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে এনে কেবল নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করলে কবিগানের প্রতি অবিচারই করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন ইংরেজের নতুনসৃষ্ট রাজধানী কলকাতা নগরীই কবিগানের জন্মভূমি, আর সেখানকার বণিক-মুৎসুদ্দি-খেটেখাওয়া জনগণই তার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তাঁর এই অনুমান কতখানি বাস্তবসম্মত তাতে সন্দেহ আছে। কেননা কলকাতা নগরীর পত্তনের অনেক আগেও পল্লিবাংলায় কবিগানের প্রচলন ছিল। নাগরিক কলকাতার রুচিশিক্ষাহীন 'হঠাৎ-বাবুদের সভায়' উচ্চমূল্যে সওদা হতে এসে কবিগানের স্বাভাবিকতা ক্ষুন্ন হল- এই মাত্র। কিন্তু সেখানেও কোনো কোনো স্থলে রসের এমন সম্ভোগ, বুদ্ধির এমন চমক, ভাবের এমন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যা প্রশংসা না করে উপায় নেই। আসলে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) পরই মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) আবির্ভাব হলে হয়তো ভালো হত, কিন্তু ইতিহাস তো তার নিজের ছন্দেই চলবে। ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) তিরোধানের পর যখন বড় কোনো কবি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হননি, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে কবিয়ালদের মতো ব্রাত্যজনেরাই। বৈষ্ণব পদাবলির বিশুদ্ধ কাব্যসুষমা হয়তো তাতে অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি ছিল না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে সর্বতভাবে একমত হওয়া যায় না। অনেকে এ বিষয়ে একমত হতেও পারেননি। যেমন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন-

> 'বৈষ্ণব পদাবলী যেমন ধর্মীয় আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কবিগান তেমন নয়, এবং বৈষ্ণব পদকর্তাদের যে-ধরনের শিক্ষাদীক্ষা, বোধ ও অনুভূতি ছিল কবিওয়ালারা অধিকাংশ স্থলেই তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কবিগান প্রথম দিকে

গ্রামীণ বাংলার লোকগীতির আদর্শকেই ভিত্তি করেছিল। ঝুমুর-যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতি লোকরঞ্জক গীতিকার সঙ্গে এর ছিল কৌলিক সম্পর্ক।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ শাক্ত ও বৈষ্ণব পদের সঙ্গে কবিগানের তুলনা টেনে যে সমালোচনা করেছেন, অনেক সময় নিজেও এই বক্তব্য নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলির খণ্ডিতা ও মানিনী রাধার ঈর্ষা ও ব্যাকুলতা নির্দেশক গানগুলি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। কেননা সেখানে স্থূলতা, গ্রাম্যতা, চটুলতা উৎকট রূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কবিগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ভবানীবিষয়ক ও সপ্তমী পর্যায়ের গানগুলি, যেখানে মা মেনকা ও কন্যা উমার মান-অভিমান ও মিলন-বিরহের আর্তি লুকিয়ে আছে, সেগুলির প্রশংসা করতে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ-

'গিরিরাজ-মহিষীর উমার যে অভিমান-কলহ তাহাতে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে না- তাহা সর্বত্রই সুমিষ্ট বোধ হয়। তাহার কারণ, মাতৃস্নেহে উমার যথার্থ অধিকার সন্দেহ নাই; কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত তাহাতে স্নেহসমদ্র কেবল সুন্দরভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে।'[৫]

অর্থাৎ কবিগানের ভবানীবিষয়ক বা সপ্তমী পর্যায়ের গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তেমন একটা অভিযোগ নেই। যত অভিযোগ সখীসংবাদ বা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক চটুল পদগুলি নিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো তাঁর 'বর্ষাযাপন' (সোনার তরী, ১৮৯৪) কবিতায় বৈষ্ণব কবির কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে মানবীয় প্রেমের কোনো অস্তিত্ব আছে কি'না! কবিয়ালরা তাদের অমার্জিত, নিরাভরণ গানের মাধ্যমে তো সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে সাধারণ জনগণের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন এই সমস্ত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কবিয়ালরা। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মতকে তুলে ধরা যেতে পারে-

'সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিগানের একটি চিরন্তন তাৎপর্য আছে ইহা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাববেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া সার্বভৌম রসানুভূতির ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে এই দিক দিয়া কবিয়ালেরা আধুনিক বৈষ্ণব-ভাবাশ্রয়ী কবিগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূরী।'[৬]

বৈষ্ণব পদাবলির আদর্শে নির্মিত কবিগানের সখীসংবাদ অংশে ভাবের গাঢ়ত্ব ও রচনার ঐশ্বর্য না থাকার আর একটা বড় কারণ হল, কবিগানের শ্রোতা। অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষজনই কবিগানের অনুরাগী শ্রোতা। তাই তাদের উপযোগী করে নির্ভেজাল কবিগানে কবিয়ালদের কিছুটা জল মেশাতে হয়েছে বইকি। কিন্তু তার মধ্যেও একটা স্বভাবসৌন্দর্য ও নির্মলতা আছে, যা দর্শক-শ্রোতাদের এখনও টানে। রাঢ়ের আধুনিক কবিগানে আলাদা করে সখীসংবাদের গান নেই (পূর্ববঙ্গের কবিগানে এখনও সখীসংবাদ গাওয়া হয়)। আধুনিক কবিগানের পালাভিত্তিক আলোচনায় এমন অনেক পদ রয়েছে যেখানে বৈষ্ণব ও শাক্তপদের বিশুদ্ধতারই স্পর্শ পাওয়া যায়-

'ও মা ঈশানী, একবার বল মা শুনি

তো'কে কত ভালোবাসে ভোলা ত্রিশুলপাণি। (ধ্রু)

প্রথম কলি-

রাজার মেয়ে হয়ে ও তুই ভিখারির ঘরে

বসবাস করিস বল মা কেমন করে

তোষে কি সাদরে তোরে গঙ্গাধরে

তোকে রাখে কেমন করে সেই শিব-শূলপাণি

ও মা ঈশানী...

দ্বিতীয় কলি-

ও'রে বহু যত্নের ধন তুই রে উমা রতন

সে যত্ন জানে কি ভোলা পঞ্চানন

ভস্ম-বিভূষণ বাঘাম্বর-ধারণ

শ্মশানেতে ভ্রমণ করে দিন যামিনী

ও মা ঈশানী...

তৃতীয় কলি-

তৈলাভাবে শিবের মাথায় হইল জটা

জটার ভিতর আবার আছে গঙ্গাআঁটা

কটি তটে হেরি ফনী বড় গেটা

খায় সিদ্ধি খোটা দিবস রজনী

ও মা ঈশানী...

চতুর্থ কলি-

কৈলাস শিখরে বারোমাস থাকো

মা বলে কি তোমার মনে পড়ে নাকো

মা'র কথা রাখো, মা বলিয়া ডাকো

পরাণ জুড়াক মা যে কাঙালিনী

ও মা ঈশানী...

পঞ্চম কলি-

বহুদিন পরে এসেছ মা ঘরে

আর যেতে দেবো না মা কৈলাসপুরে

ভোলা এসে মোরে বললেও বারে বারে

যেতে দেবো না মা তোরে থাকিতে পরানী

ও মা ঈশানী...

ষষ্ঠ কলি-

এ দীন শঙ্করে দে'মা মুক্ত করে

দুঃখ পূর্ণ হাল লাগা মা কিনারে

মা হয়ে এবারে স্বহস্তে হাল ধরে

নাও পরপারে কর, ঘর রূপা তরণী

ও মা ঈশানী, একবার বল মা শুনি।।'[৭]

এই গানটিকে শাক্ত পদাবলির চেয়ে কোনো অংশে খাটো করা যাবে না। রাঢ়ের আধুনিক কবিগানে এই রকম গানের সংখ্যা কম নয়। এই আধুনিক কবিগান সম্পূর্ণ অশ্লীলতা বর্জিত এবং ব্যক্তি আক্রমণশূন্য। শুধু আধুনিক কবিগানই নয়, প্রাচীন কবিগানে রাম বসু (১৭৮৬-১৮১৩), হরু ঠাকুরের (১৭৩৮-১৮২৪) বিরহ পর্যায়ের এমন অনেক গান আছে, যেখানে সহজাত কবিত্বের ছাপ স্পষ্ট। বৈষ্ণব পদাবলির মতো আবেগের গভীরতা ও প্রকাশের সূক্ষ্মতা তেমন উচ্চাঙ্গের না হলেও, নায়ক-নায়িকার বিরহ, যন্ত্রণা, বিলাপ ও আক্ষেপের মধ্যে এক নির্ভেজাল মর্ত্য-স্পর্শ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিগানের প্রকাশ ভঙ্গিমা, সংগীত পরিবেশনের পদ্ধতি নিয়েও খুব একটা খুশি ছিলেন না। কবিওয়ালাদের মধ্যে তিনি কোনো মৌলিকত্বই খুঁজে পাননি। বরং 'বর্বর' কবিগানে কেবল 'তাল প্রয়োগের খচমচ কোলাহল'-ই শুনেছেন-

> 'তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধম সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি-সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।'[৮]

কবিগানের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা থাকলেই হয়তো এমন কর্কশ সমালোচনা করা যায়, যা সাধারণত রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ কবিগানের সঙ্গে 'কবি' শব্দটি'কে বোধহয় মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কবিগানের চেয়ে অনেক অশ্লীল নিম্নরুচির গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কলমে এই রকম নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হওয়া যায় না। কবিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্রই হল বাংলা ঢোল ও কাঁসি অথবা খঞ্জনী। কিন্তু চারজোড়া অর্থাৎ আটখানি ঢোল নিয়ে কোথাও কবিগান পরিবেশিত হয়েছে এমন সংবাদ কখনই কোনো সংগ্রাহক বা সমালোচক পাননি। তাহলে রবীন্দ্রনাথ এ তথ্য পেলেন কোথা থেকে? এই প্রবন্ধ লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ যে কবিগান কোথাও শুনেছেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তা না হলে চারজোড়া ঢোলের খবর তিনি কোথায় পেলেন? কবিগানের মধ্যে চটকদারি আছে, কবিগানের সুরও অত্যন্ত লঘু, এই সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও, কবিগানে চারজোড়া ঢোলের ব্যবহারের বিষয়টি মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়। আসলে আমার দৃঢ় ধারণা রবীন্দ্রনাথ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) সংকলিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৮৯৪) নামক কবিগানের গ্রন্থ পাঠ করে এই প্রবন্ধ লিখেছেন। তাই কবিগানের রচনাগত আঙ্গিক ও গঠন পারিপাট্য নিয়েও তিনি খুশি হতে পারেননি। তাই তাঁকে বলতে শুনি-

> 'কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস- ভাব, ভাষা, এমন-কি ব্যাকরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগলভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। অথচ তাহার যথার্থ কোনো নৈপুণ্য নাই, কারণ তাহাকে ছন্দোবদ্ধ অথবা কোনো নিয়ম রক্ষা করিয়াই চলিতে হয় না।'[৯]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই বলতে হয়, কবিগান শ্রব্য সাহিত্য। আর, যা সুর সহযোগে শোনার জন্য লিখিত হয়, তা পাঠ করতে গেলে সেই আস্বাদ কোনো ভাবেই পাওয়া যায় না। ছন্দ-সুরের চমৎকারিত্বে রচনাগত ত্রুটি অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' পাঠ করে অবক্ষয়িত যুগের কবিগানকে দেখেছেন। কিন্তু কবিগানের আসল ক্ষেত্র বইয়ের পাতা নয়, কবিগানের আসর। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সুন্দর কথা না বললেই নয়-

> 'কোনো কৌতূহলী পাঠক মুদ্রিত কবিগান পড়তে গেলে প্রতিপদে ছন্দের ত্রুটিতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেযুগে কবিগান পড়া হত না, গান করা হত, এবং গানের সুরতালে অনেক সময়ে ছন্দের ত্রুটি বা ফাঁকের কথা মনে থাকত না, বা কানেও ধরা পড়ত না। তাই আজ কবিগানকে রচনার দিক থেকে যতটা ব্যর্থ মনে হচ্ছে, গানের আসরে সেযুগে তা ততটা মনে হত না।'[১০]

কবিগান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বক্তব্যের যুক্তিহীন বিরোধিতা করা একেবারেই আমার উদ্দেশ্য নয়। মূলত যেখানে একপেশে সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে, সেই সমস্ত দিকগুলি তুলে ধরে এবং অন্যান্য সমালোচকদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরাই একমাত্র উদ্দেশ্য। 'কবি-সংগীত' (সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হল, বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে কবিগানের জন্ম। সেখানে প্রেমের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতাই প্রাধান্য পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কবিগানে তা সর্বাংশে পরিত্যক্ত হয়েছে। কবিগানে বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমের মহত্ত্বই শুধু নয়, প্রেমের বিচ্যুতিও বড় হয়ে দেখে দিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলির অতীন্দ্রিয়তা, শুচিস্নিগ্ধতা এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সখীসংবাদের গানে কবিয়ালরা প্রেমের বঞ্চনা ও ছলনাকেই গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, কবিগানে প্রেমের বিচ্যুতি আসলে সমাজেরই বিচ্যুতি, সময়ের বিচ্যুতি। কবিগান যে সময়ে ফুলে-ফলে বিকশিত হচ্ছে তখন বৈষ্ণব পদাবলির অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুর্য আর কোথাও অবশিষ্ট ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলির কাল অনেক দিন হল অবসিত হয়ে গেছে। যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা হল বৈষ্ণব পদাবলির সাংগীতিক প্রাণরস এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কথনের লৌকিকতা। কবিয়ালরা তাকেই উপজীব্য করেছে দর্শক-শ্রোতার পরিতৃপ্তির জন্য। সহজিয়া সাহিত্যের তত্ত্বগন্ধী স্থূলত্ব ও গূঢ়তা কবিগানে প্রাধান্য পায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই বৈষ্ণব পদাবলির ধর্মীয় গণ্ডী সেখানে ছিঁড়ে গেছে। 'কৃষ্ণ কলঙ্কে কলঙ্কী' হওয়ার শ্লাঘা কবিয়ালরা ত্যাগ করতে পারেননি। খণ্ডিতা রাধার মনোবেদনা, বহুবল্লভ কৃষ্ণের ছলচাতুরী বৈষ্ণব পদাবলির ধর্মীয় পরিমণ্ডলে একরকম মানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবিয়ালদের হাতে পড়ে ধর্মীয় খোলস উন্মুক্ত হয়ে জনগণের দরবারে পরিবেশিত হওয়ার সময় তা কিছুটা অশোভন লাগে ঠিকই, কিন্তু জনগণের দরবারে তা নিঃসন্দেহে উপাদেয় ছিল সেই সময়ে। ঠিক এই কারণেই খণ্ডিতা ও মানিনী রাধার ঈর্ষা ও ব্যাকুলতা নির্দেশক কবিগানের পদগুলি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি বলে আমার মনে হয়। আর অশ্লীলতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়েই বলতে হয়, অশ্লীলতা তৎকালীন সময়ে অনেকটাই সমাজ সমর্থিত ছিল। মনে রাখতে হবে, কবিগান দরবারি সাহিত্য নয়, জনসাহিত্য। জনগণের রুচির মর্যাদা দেওয়াই কবিয়ালদের কাজ। তৎকালীন জনরুচির বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে নিতাই বৈরাগী সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের একটি বক্তব্যেই-

> 'বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটোলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্ব্বক কহিল 'হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই, ফ্যার্ ঝদি কালকুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড়ু গা।'[১১]

এই খাড়ু বা অশ্লীল খেউড় গানেই সাধারণ অশিক্ষিত শ্রোতার পরিতৃপ্তি। তাছাড়া শুধু ইতরজনই নয়, কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাবুদের মতো অভিজাত ব্যক্তিও এই অশ্লীল খেউড় গান উপভোগ করতেন। কবিগানের যে অশ্লীলতা তা বাংলা সাহিত্যের অশ্লীলতার ধারাপ্রবাহেরই ফসল। বৈষ্ণব পদাবলিতেও অশ্লীলতা ছিল, কিন্তু তা ছিল ধর্মীয় মোড়কে আবৃত। গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে প্রায় পাঁচশো বছর কাল এই অশ্লীলতার প্রবাহ বহমান ছিল। কবিগান তো তাদেরই অনুসারী। জনরুচির মানদণ্ডে অশ্লীলতার সংজ্ঞা দিনে দিনে বদলে যায়। তখনকার দিনে যা শ্লীল এখন তা অশ্লীল মনে হতে পারে। সুতরাং কবিগানের অশ্লীলতার দিকটি একবারে ক্ষমার অযোগ্য এবং সেই অপরাধে কবিগানকে অচ্ছুৎ করে রাখার কোনো যুক্তি আছে বলে মনে করি না।

রবীন্দ্রনাথ কবিগানের মধ্যে 'ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য' এর অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কবিগানের মধ্যে তা না থাকার যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, সেখানে কবিগানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির অভাব সহজেই লক্ষিত হয়। একথা ঠিক যে 'কবিসংগীত' প্রবন্ধেই প্রথম রসভোগের দৃষ্টিতে কবিগানের স্বরূপ আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু কিছু স্থলে কবিগানের প্রতি এমন অনাবশ্যক নির্মমতা প্রকাশ পেয়েছে, যা আমাদের পীড়িত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলির জয়ধ্বনি করেছেন, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রশংসা করে তাকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তার উজ্জ্বলতা ও কারুকার্যের প্রতি মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কবিগানকে ক্ষণিক উত্তেজনা বশত 'ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি'

বলে কটাক্ষ করেছেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের রাজসভার কবিদের সঙ্গে এই জনসভার কবিদের তুলনা করতে চেয়েছেন। সময়ের দাবি, জনগণের দাবিকে অস্বীকার করে, কেবল সাহিত্য রসিকের চোখে কবিগানকে দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারাবার হতাশ হয়েছেন। আর তখনই নেমে এসেছে তীব্র সমালোচনার চাবুকাঘাত। কবিগানের অশ্লীলতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অভিযোগ মেনে নিতে দ্বিধা নেই। আসলে কবিগানের যাবতীয় অখ্যাতি ও কলঙ্ক মূলত লহর-খেউড়ের মতো অশ্লীল ব্যক্তি-আক্রমণাত্মক গানের জন্যই। কিন্তু খেউড় ও লহরের মতো গানে ভদ্রতা ও শ্লীলতার সীমা না রাখাই ছিল তৎকালীন রীতি। এখানে অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা, ব্যক্তি-আক্রমণ যত কটূ হত, শ্রোতাদের সম্মতিসূচক আনন্দ লহরী ততই তীব্র হত। এই নিম্নরুচির গান শিক্ষিত ভদ্র সমাজে অশ্রব্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু রুচির কথা বাদ দিয়ে কবিওয়ালাদের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে, এই গানগুলি কিছুটা হলেও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করি।

আসলে কবিগানের আসরে চাতুর্যের সঙ্গে চটপট রংদার জবাব দেওয়া ও বুদ্ধি ও ক্ষুরধারত্বের উপরই কবিওয়ালাদের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সুতরাং এই গানগুলিকে লোকসাহিত্য তথা মৌখিক সাহিত্যেও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা উচিত। যদিও অনেকেই কবিগানের মধ্যে লিখিত পাঁজিপুঁথির অস্তিত্ব লক্ষ করে একে লোকসাহিত্যের মর্যাদা দিতে চাননি। কেননা কবিগান মৌখিক সাহিত্য হয়েও, তার লিখিত রূপটি বারবার গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া কবিগানে ব্যক্তির ভূমিকাই (কবিয়ালদের) প্রধান। কিন্তু লোকসাহিত্য সাধারণত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সমষ্টির সম্পদ। যেখানে দেশ ও জাতির ঐতিহ্য উজ্জ্বলভাবে গ্রথিত থাকে। লোকসাহিত্যের মধ্যে থাকে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সরল আনন্দের মূর্ছনা। কিন্তু কবিগানের মধ্যে রয়েছে কৃত্রিমতা ও অর্থ-উপার্জনের সচেতন প্রয়াস। বাঁধনদাররা গান বেঁধে দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতেন। কবিয়ালরা আসরে পুনরায় ডাক পাওয়ার লোভে উদ্যোক্তা বা পৃষ্ঠপোষকের প্রশস্তি করতেন। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের মোহে বিপক্ষ কবিয়ালকে নির্লজ্জভাবে ব্যক্তি আক্রমণ করতেও ছাড়তেন না। এইসমস্ত কারণে অনেকেই কবিগানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি নয় (যদিও আধুনিক কবিগানে অশ্লীলতার অপবাদ আর নেই বললেই চলে)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিগানের কঠোর সমালোচনা করলেও, কবিগানকে লোকসাহিত্যের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেননি। এই গীতিশাখা বিশুদ্ধ শিল্পবোধ ও ভদ্রশ্রেণির মার্জিত কাব্য-সংগীত থেকে জন্মলাভ না করেও রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কবিসংগীত' নাম পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এটিও কম গৌরবের কথা নয়। কবিগানের ভাগ্যে না হয় এই টুকুই জুটুক।

তথ্যসূত্র

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'লোকসাহিত্য', 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'লোকসাহিত্য', 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭৬।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'লোকসাহিত্য', 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭৭।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'লোকসাহিত্য', 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ । 'লোকসাহিত্য', 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-৮২।

দত্ত, ভবতোষ (সম্পাদিত) । 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ-১৮২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'- চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ-৮৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'- চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকতা, ২০০৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ-৮৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সংগমে', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ- ১৩৭।

'ব্যক্তিগত সংগ্রহ', কবির আসর- অগ্রদ্বীপ, বর্ধমান, আশ্বিন ১৪২০, কবিয়াল- কাঞ্চন মণ্ডল।

রাকিব, আবদুর । 'চারণকবি গুমানী দেওয়ান', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ-১৩৩।